আমার কলেজ ঃ কিছু স্মৃতিচারণা

মিহির খাঁ

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র সংবিধান বিশেষজ্ঞ, দক্ষ সাংসদ ও বাগ্মী হিসাবে অতি সুপরিচিত। শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ না করলেও পণ্ডিত মৈত্র এই শান্তিপুরেই তাঁর কর্মজীবন সুরু করেছিলেন, তাঁর কর্মসাধনার সূত্রপাত হয়েছিল এই মাটিতেই। তাঁর পিতা রজনীকান্ত মৈত্র এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে প্রাসাদোপম বাড়ী নির্মাণ করেছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে শান্তিপুরে পণ্ডিত মৈত্রের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি শান্তিপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং রেল ষ্টেশন ভবন নির্মাণ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিতপরেই ডাঃ সুকুমার দাস তাঁর গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর যে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন সেই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু গণ্যমান্য নাগরিকের উপস্থিতিতেপণ্ডিত মৈত্র তাঁর ভাষণে শান্তিপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন এবং এই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের সংকল্প ঘোষণা করেন। শান্তিপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে কিনা, এ নিয়ে কারো কারো মনে সেদিন সন্দেহ জেগেছিল। কিন্তু কর্মযোগী উদ্যমী পুরুষ পণ্ডিত মৈত্রের মনে এ নিয়ে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। কলেজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করার পর বস্তুতপক্ষে তিনি একাই প্রথমদিকে কাজে নেমে পড়েছিলেন। তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী সেনেট সদস্য ছিলেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন তিনি। এই সূত্রে মৌলানা আজাদের সঙ্গে কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পূর্বেই আলোচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারী অর্থ অনুদান মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গেও তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। এই কারণে কলেজ প্রতিষ্ঠায় রাজ্য সরকারের সহায়তাও তিনি পেয়েছিলেন। সেনেট সদস্য হিসাবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকায় কলেজটির অনুমোদন লাভও ত্বরান্বিত হয়েছিল।

পণ্ডিত মৈত্রের সঙ্গে মৌলানা আজাদের হৃদ্যতা এত নিবিড় ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে রাজ্যের কলেজগুলির জন্য আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করা হলে দিল্লি থেকে মৌলানা আজাদ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কে ব্যক্তিগত অনুরোধ করতেন যে পণ্ডিত মৈত্রের কলেজের (অর্থাৎ শান্তিপুর কলেজ) আর্থিক বরাদ্দ যেন ছাঁটাই করা না হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ও মৌলানা আজাদের অনুরোধের মর্যাদা দিতেন।

স্বাধীনতা লাভের পর শান্তিপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য পণ্ডিত মৈত্রের উদ্যোগ বস্তুতপক্ষে এখানকার জনমনে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক ছিল। কেননা স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে নানা উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জোয়ার এসেছিল এবং সেই সব কর্মপরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য মানুষের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। সেদিনের শান্তিপুর নামেই সহর ছিল। এখানে নাগরিক সুবিধা বিশেষ কিছু ছিল না। বিদ্যালয়-শিক্ষা সমাপনের পর কলেজীয় শিক্ষার কোন সুযোগ এখানে ছিল না।কলেজ বলতে সারা জেলায় ছিল একটি মাত্র কলেজ - কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ। যোগাযোগ ব্যবস্থাও তখন তেমন উন্নত ছিল না। ফলে শান্তিপুরের বাইরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা আর্থিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক নানা কারণে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। এই কারণেই তৎকালীন শান্তিপুরে উচ্চ শিক্ষা প্রসারিত হচ্ছিল না। অথচ সদ্য স্বাধীন দেশের নাগরিকের

প্রাথমিক চাহিদা ছিল শিক্ষা। পণ্ডিত মৈত্রই প্রথম জননেতা যিনি শান্তিপুর বাসীর উচ্চ শিক্ষার সুযোগের এই অভাবটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি শান্তিপুরে উচ্চশিক্ষাদানের জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে শান্তিপুর বাসীর দীর্ঘদিনের আকাঙ্খাকে বাস্তব রূপদান করেছিলেন। এই কারণেই তিনি আজও শান্তিপুরের মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে আছেন।

কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রাথমিক শর্ত ছিল উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি সংগ্রহ করে দিতে হবে। পণ্ডিত মৈত্র স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিদের কাছে জমির জন্য আবেদন জানালে সে আবেদনে সাড়া দেন অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়। উদার হৃদয় দানশীল অটলবিহারী মৈত্র প্রবাসী ছিলেন। এখানে খড়জোলাতে তাঁর বিশাল যে বাগানবাড়ী ছিল সেখানে তিনি মাঝে মাঝে এসে বাস করতেন। বিশাল বাগানবাড়ীতে দ্বিতল ভবন ও মূল্যবান বহু ফলের বৃক্ষ এবং নানা প্রকার দুর্মূল্য ওষধি গাছগাছালি ছিল। পাড়বাঁধানো একটি পুকুরও ছিল সেখানে। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য মৈত্র মহাশয় তাঁর বিশাল বাগানবাড়ী নিঃশর্তে দান করে দেন। জাতীয় সড়ক সংলগ্ন রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত জমিখণ্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় এখানেই কলেজের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। তৎকালীন রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাট্জু এই কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন।

কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে তহবিল খোলা হয় সেখানে আপামর জনসাধারণ যথাসাধ্য দান করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান আসে এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈকা বিদুষী মহিলার নিকট থেকে। তিনি শান্তিপুরের অন্যতম কৃতী সন্তান আবদুর রাজজাক সাহেবের পরমশ্রদ্ধেয়া জননী আবাদুননেসা। এই বিদুষী মহিলা নিজেকে নিঃশেষিত করে তাঁর জীবনের শেষ সঞ্চয় দশ হাজার টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিঃশর্তে দান করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। এই মহিলা নিজের সন্তানদের চরিত্রগঠন ও লেখাপড়ার দিকে খুবই মনোযোগী ছিলেন। সে সময়ে স্থানীয় মুসলিম সমাজে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত। মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার কোন সুযোগই ছিল না। তৎকালীন মুসলিম সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে একজন প্রাচীনপন্থী মুসলিম মহিলার সারা জীবনের শেষ সঞ্চিত অর্থ ও অলঙ্কার উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য নিঃসর্ত দান নিঃসন্দেহে আলোড়নসৃষ্টিকারী একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সে সময়ে কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই বিদুষী বিদ্যানুরাগিনী মহিলা পণ্ডিত মৈত্রের হাতে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার দান করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা।

দেশের দুর্ভাগ্য যে কলেজ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যেই পণ্ডিত মৈত্রের অকালমৃত্যু হয়। একথা বলাই বাহুল্য যে কলেজটি গড়ার মুখে পণ্ডিত মৈত্রের মত সুযোগ্য কর্ণধারের মৃত্যু সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। সবুজ সুষমা মণ্ডিত অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাদানের উপযোগী আদর্শস্থানীয় একটি অনন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানরূপে এই কলেজটিকে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুর ফলে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি তাঁর পরিকল্পিত পথে গড়ে উঠতে পারেনি। কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নের কাজও ব্যাহত হয়েছে। তবুও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পণ্ডিত মৈত্রের স্বপ্নকে যথাসাধ্য রূপায়িত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ তারিণীচরণ চৌধুরী। সুদক্ষ প্রশাসক ও সুযোগ্য শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি ছিল তাঁর। পণ্ডিত মৈত্রের অবর্তমানে কলেজটিকে ডিগ্রীস্তরে উন্নীত করার ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ

ডঃ চৌধুরীর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। পণ্ডিত মৈত্রের স্মৃতিতে ''লক্ষ্মীকুঞ্জ'' নির্মাণ এবং ''অশোক কুঞ্জ'' ও ''হরিতকি কুঞ্জ'' - এর প্রতিষ্ঠা ডঃ চৌধুরীর অন্যতম কীর্তি। এই সব কুঞ্জে সে সময় নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল। গাছ-গাছালি পরিবৃত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এই সব কুঞ্জে শিক্ষকগণ যখন ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করতেন তখন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশের কথাই মনে হত। কলেজের প্রধান প্রবেশ পথে পণ্ডিত মৈত্রের নামাঙ্কিত যে গেটটি রয়েছে সেটি নির্মাণ করেছিলেন তারিণীবাবু।

১৯৫৫/৫৬ সালে একবার একদল বিদেশী ডেলিগেট (বোধ হয় রাশিয়ান) শিক্ষামূলক পরিভ্রমণে এই রাজ্যে এসে শান্তিপুর কলেজ পরিদর্শনে এসেছিলেন। অধ্যক্ষ ডঃ চৌধুরী ঐ বিদেশী অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে লক্ষ্মীকুঞ্জে মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। বিদেশী অতিথিবৃন্দ এই কলেজের প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে সম্মোহিত হয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় কলেজ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু কলেজের আভ্যন্তরীণ সমস্যাজনিত কারণে তিনি কার্যকালের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই চলে যান।

কলেজে সে সময় অনেকেই ছিলেন প্রকৃত অর্থে ছাত্রদরদী শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে একজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক রাসবিহারী বসু। অবশ্যই তিনি একজন ব্যতিক্রমী মানুষ ছিলেন। প্রায় বৃদ্ধ অথচ বয়সের ভারে ন্যুব্জদেহী ছিলেন না অধ্যাপক বসু। তাঁর ক্লাস কোনদিন ফাঁক যেত না। ক্লাসে যেতেন ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে গেলেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ থাকত না। পাঠদান সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ক্লাস ছেড়ে আসতেন না। একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত। সেসনের মাঝপথে অধ্যাপক বসু এখান থেকে ইস্তফা দিয়ে কলকাতার একটি কলেজে চাকুরী নিয়ে চলে গেলে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা করতে না পারায় পদার্থবিদ্যার ক্লাসগুলি বন্ধ হয়ে যায়। পরীক্ষা আসন্ন অথচ শিক্ষকের অভাবে পদার্থবিদ্যার ক্লাস হচ্ছে না। ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সংবাদ কলকাতায় অধ্যাপক বসুর কাছে পৌঁছনোমাত্র তিনি একদিন কলেজে এসে অধ্যক্ষ মহাশয়ের উপস্থিতিতে ছাত্রদের আশ্বাস দিয়ে বললেন যে তিনি প্রতিটি ছুটির দিনে (রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন) কলকাতা থেকে এখানে এসে সকাল থেকে বৈকাল পর্যন্ত একটানা ৫/৬ ঘণ্টা ক্লাস নিয়ে পাঠক্রম সম্পূর্ণ করে দেবেন। প্রতিটি ছাত্রকে ক্লাসে উপস্থিত থাকার নির্দেশ তিনি দিলেন। কথানুযায়ী তিনি ছুটির দিনে এখানে এসে একটানা কয়েক ঘণ্টা ক্লাস নিতেন। একটানা ক্লাস করতে ছাত্ররা ক্লান্তি বোধ করলেও অধ্যাপক বসু বার্দ্ধক্যের সীমানায় পৌঁছেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাস নিতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বোধ করতেন না। এইভাবে তিনি ছাত্রদের প্রতি একজন শিক্ষকের দায়বদ্ধতা ও কর্তব্যবোধের অনন্য নজির রেখে গেছেন। তখনকার দিনে অল্পবেতনের শিক্ষকগণ ছাত্রদের প্রতি কর্তব্যবোধ ও দায়বদ্ধতার যে প্রমাণ দিয়ে গেছেন, আজকের দিনে ঈর্ষণীয় বেতনভোগী হয়েও অনুরূপ কর্তব্য সচেতন শিক্ষক বস্তুতই দুর্লভ।

· তখনকার দিনে কলেজে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ছিল অতি সুমধুর। কলেজের অভ্যন্তরে রাজনীতির নামগন্ধও ছিল না। ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন হত প্রতি বৎসর। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হত। কিন্তু কোন তিক্ততা বা বৈরিতা ছিল না। নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীরা সকলের সঙ্গে মিলে মিশে ইউনিয়নের কাজকর্ম চালাতেন। অবশ্য তখন কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাই সমস্যাও ছিল কম। আজকাল ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আশাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধিপাওয়ায় সমস্যাও বেড়েছে অভাবিতভাবে। ক্রমবর্ধিত সমস্যার ভারে এখন কলেজ প্রশাসন প্রতিনিয়ত নাস্তানাবুদ হচ্ছে। এ ছাড়াও আছে আর্থ-সামাজিক নানাবিধ সমস্যা। এসব সমস্যার স্থায়ী গ্রহণযোগ্য কোন সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সব সমস্যা ক্রমশ জটিলতর হচ্ছে, গভীরতর হচ্ছে। পরিণতিতে

কলেজের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ-প্রতিবেশ শিক্ষার অনুকূল না হয়ে ক্রমশই প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ক্ষেত্র বিশেষে কলেজ-বহির্ভূত দুষ্টশক্তির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তৎপরতা কলেজের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে অযথা জটিল করে তুলছে।

কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠায় ও কলেজের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যাঁরা নানাভাবে অবদান রেখে গেছেন তাঁদের প্রতি আনত প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই। কলেজের যাত্রাপথে অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হল। অবশ্যই এটি কম গৌরবের নয়। যাঁদের দানে, সেবায় ও আত্মত্যাগে আমাদের প্রিয় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির জীবনে অর্ধশতাব্দীর সাধনাধন্য গৌরবমুকুট অর্জন সম্ভব হয়েছে, পরমকৃতজ্ঞতায় তাঁদের সকলকে আজ স্মরণ করছি। আজকের ও আগামী দিনের সকল বাধা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্ম ঐতিহ্যসচেতন হয়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর গৌরব বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর যোগ্য ভূমিকা পালনে তৎপর হবে এই আমাদের ঐকান্তিক আশা। শান্তিপুর-গৌরব পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের পুণ্য স্মৃতি তাঁর স্বপ্নের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অক্ষয় হয়ে থাক্, তাঁরই জয়ঘোষণা করুক এই প্রতিষ্ঠান — সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে এই কামনাই করি।

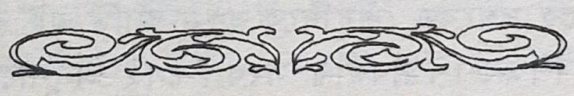

"....স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না, তবে যে-ই আঁকুক, সে ছবিই আঁকে ....।"

— রবীন্দ্রনাথ